بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব

যুক্তরাজ্যের ২০০৯ সালের বার্ষিক জলসায় প্রদত্ত
প্রফেসর সালেহ্ মুহাম্মদ আলাদীন সাহেবের বক্তৃতা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين * إياك نعبد وإياك نستعين * اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين (آمين)

অধমের বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব। বাহ্যিক চোখ দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার সত্ত্বা দেখা যায় না ঠিকই তবে শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণিত। চন্দ্র-সূর্য এবং তারকারাজি নিরবধি আমাদের সেবায় নিয়োজিত। আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয় ফলে বিভিন্ন প্রকার রিয্ক আমরা লাভ করি। আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিটি কণা স্বীয় অপূর্ব বা বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাঁর অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রতিটি জীব-জন্তু স্বীয় সৃষ্টিশৈলী দ্বারা খোদার প্রতি ইঙ্গিত করে। প্রত্যেক মানুষ যে উৎকণ্ঠার সময় তাঁকে ডাকে, তা সে যে ধর্মের সাথেই সম্পর্ক রাখুক না কেন আল্লাহ্ তা'লা তার প্রার্থনা শ্রবণ করেন আর তার কষ্ট দূরীভূত করে আপন অস্তিত্বের প্রমাণ দেন। পূত-পবিত্র বান্দাদের সাথে তিনি কথাও বলেন আর বাক্যালাপ দ্বারা আপন সত্ত্বা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন। তিনি নবীদেরকে অদৃশ্যের বিশেষ জ্ঞান প্রদান করেন। তাদের মাধ্যমে সেসব বিস্ময়কর অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ করেন এবং চরম বিরোধিতা সত্বেও তাদের সফলতা দান করে জানিয়ে দেন যে, আমি আছি।

বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা অনেক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি আর এই ফলাফলে উপনীত হই যে, অবশ্যই এই বিশ্বের একজন খোদা থাকা প্রয়োজন। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, أفي الله شك فاطر السماوات والأرض *(সূরা আল্ ইব্রাহীম: ১১)* যারা ধর্মে বিশ্বাস করেন - জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের কাছে বড় একটি মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার কালাম বা ঐশী গ্রন্থ। যেভাবে জামাতে আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.) তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেন:

'সকল প্রশংসা আদি অন্তের প্রভুর!
যাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই।
যাঁকে আমরা চিনেছি তাঁর কালামের মাধ্যমে।

আদিকাল থেকেই আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক জাতিতে স্বীয় নবী প্রেরণ করে এসেছেন আর তাদেরকে নিজ বাণী দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আমাদের নেতা ও মনিব খাতামান্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর উপর পবিত্র কুরআন আকারে স্বীয় মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যা তাঁর অস্তিত্বের একটি অতুলণীয় দলীল বা প্রমাণ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদীন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

আমাদের সাবেক ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় ১৯৯৮ সনে 'Revelation, Rationality, Knowledge and Truth' নামে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ রচনা করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। 'ইলহাম-আকল-ইলম আওর সাচ্চায়ী' নামে এর উর্দূ অনুবাদও

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

(বাংলা নাম: ঐশী জ্ঞান, ইলহাম এবং সত্য - অনুবাদক) ছাপা হয়েছে। এছাড়া আরবী এবং ভারতের মালায়লম ভাষায়ও এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এই মহান গ্রন্থে বিজ্ঞান সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং আগামীর সাথে সম্পর্কযুক্ত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করেছেন যদ্বারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের বিস্ময়কর প্রমাণ পাওয়া যায়। অধম এই বক্তৃতা প্রস্তুত করার সময় সেই গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পদমর্যাদা জান্নাতে উন্নীত করুন, আমীন।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীদেরকে অদৃশ্যের বিভিন্ন সংবাদ প্রদান করেন যা তাদের জীবদ্দশায় পূর্ণ হয়ে খোদার অস্তিত্বের শক্তিশালী দলীল প্রদান করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) স্বীয় গ্রন্থে লিখেন:

> 'খোদার জ্ঞান স্থান-কাল এবং সীমানার ঊর্ধ্বে কিন্তু মানুষের নয়। যদিও সেসব জ্ঞান যা মানুষের শক্তি ও নৈপুণ্য বহির্ভূত তা খোদার ইচ্ছায় ওহীর মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। যেভাবে পবিত্র কুরআন বলে: فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۙ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ *(সূরা আল্ জিন্ন: ২৭-২৮)* অর্থ: বস্তুত: তিনি তাঁর মনোনীত নবী ছাড়া অন্য কারো কাছে অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করেন না।
>
> এটি জেনে রাখা আবশ্যক যে, উপরোক্ত আয়াত, নবী নন এমন কেউ সত্য স্বপ্ন, কাশ্ফ অথবা ইলহামের মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞান অর্জন করার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয় না। তবে এটি অবশ্যই বলেছে যে, নবীদের ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহ্ তা'লার অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে কোন ক্ষেত্রেই বুৎপত্তি অর্জন করতে পারে না।
>
> এখানে যে নীতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা হলো, নবীদের ছাড়া অন্য যাদেরকে এই জ্ঞান দান করা হয় তা ইলহামের আলোকেই হোক না কেন - তা প্রাঞ্জলতা, নির্ভূলতা এবং পূর্ণতার মাপকাঠিতে কোনভাবেই সেই জ্ঞানের মোকাবিলা করতে পারে না যা নবীদেরকে প্রদান করা হয়। এই ইলমে লুদুন্নি (খোদা প্রদত্ত জ্ঞান-অনুবাদক) যা মূলত: নবীদের দেয়া হয় তা সাধারণত আধ্যাত্মিক জগত এবং পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। ঐশী বাণী পার্থিব জ্ঞানের প্রত্যেক বস্তুর অগণিত শ্রেণীকে পরিবেষ্টন করে রাখে কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এর মাধ্যমে সর্বজ্ঞ খোদার অস্তিত্ব এবং নবীদের সত্যতা সম্পর্কে মু'মিনদের ঈমান দৃঢ়তা লাভ করা।'

(Revelation, Rationality, Knowledge and Truth - P.238)

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ্

এই উপক্রমণিকার পর আমি মহানবী (সা.)-এর একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করছি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যা পূর্ণ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার মহান অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করছে। মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন:

> 'লা ইউতরাকুন্নাল কিলাসু ফালা ইউসআ আলাইহা'

(মুসলিম-বাব নুযূলুল ঈসা)

অর্থাৎ, উষ্ট্রী পরিত্যক্ত হবে আর এতে চড়ে দ্রুত ভ্রমন করা হবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী এত স্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আরবে ভ্রমনের জন্য উট একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল - একে মরুর জাহাজ বলা হতো, কিন্তু এখন রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী, উড়োজাহাজ, বাষ্পীয় জাহাজ আবিস্কৃত হয়েছে ফলে এখন উটের পরিবর্তে আরব দেশে মোটর গাড়ীতে সফর করা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মওউদ ও মাহদীয়ে মা'হুদ (আ.) বলেন:

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

‘আরবের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে যে ব্যক্তি কিছুটা অবহিত তিনি খুব ভালো ভাবেই জানেন, উট আরবের পুরনো বন্ধু আর আরবী ভাষায় প্রায় হাজারের কাছাকাছি উটের নাম রয়েছে। উটের সাথে আরব বাসীর এত পুরনো সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায় যে, আমার জানা মতে আরবী ভাষায় প্রায় বিশ হাজারের মত কবিতা আছে যাতে উটের উল্লেখ রয়েছে আর আল্লাহ্ তা’লা ভালভাবেই জানেন যে, আরববাসীর হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য আর ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব তাদেরকে অনুধাবন করানোর লক্ষ্যে উটের এ ধরনের মহান বিপ্লবের উল্লেখ করার চেয়ে উত্তম আর কোন উপায় নেই।’

(তোহফা গোলড়ভীয়া, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খন্ড, পৃ: ১৯৬-১৯৭)

পবিত্র কুরআনে এ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা এভাবে উল্লেখ আছে: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ *(সূরা আত্ তাকভীর: ৫)* চিন্তা করে দেখ! কত প্রাঞ্জলভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে অথচ যা মহানবী (সা.)-এর যুগে ছিল চরম আশ্চর্যের, আলহামদুলিল্লাহ্। হাদীস শরীফে যেখানে উট পরিত্যক্ত হবার উল্লেখ রয়েছে সেখানে একটি নতুন বাহন আবিস্কার হবার কথাও সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, আর তা রেলগাড়ীর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে। বিষয়টিকে এভাবে হাদীসের আলোকে বুঝানো হয়েছে যে, দাজ্জালের একটি চিহ্ন হবে এরূপ অর্থাৎ সে একটি আলো ঝলমলে গাধার উপর আরোহন করবে। তার মাথার উপর ধোঁয়ার পাহাড় থাকবে আর সেই গাধা দিনরাত চলাচল করবে। সকাল-সন্ধা যাত্রীদের আহবান জানাবে। কয়েক মাইল পর্যন্ত তার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে। মাসের সফর সপ্তাহে আর সপ্তাহের সফর একদিনে এবং দিনের সফর ঘন্টায় আর ঘন্টার পথ মিনিটে পাড়ি দিবে। সে মানুষকে তার পেটের মধ্যে বসাবে। এই গাধায় লাইট এবং জানালা থাকবে। প্রতি ছয় মাইল অন্তর অন্তর তার পদক্ষেপ পড়বে।

দাজ্জালের গাধার উপরোক্ত আলামত রেল গাড়ীর মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। রেলগাড়ী দিবারাত্র চলাচল করে আর প্রতি ছয় মাইল পর পর তার পদক্ষেপ অর্থাৎ ষ্টেশন হয়ে থাকে। রেলগাড়ী যাত্রীদেরকে নিজের পেটের মধ্যে ধারণ করে সে আগুন ও পানির সাহায্যে অর্থাৎ বাষ্পের সাহায্যে চলাচল করে। একবার চিন্তা করে দেখ! চৌদ্দশ’ বছর পূর্বে মানুষকে রেলগাড়ী কেমন তা কীভাবে বুঝানো সম্ভব হতো? যা কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার চেয়ে উত্তমরূপে বুঝানোর আর কোন ভাষা জানা নেই। রেলগাড়ী আমাদেরকে স্মরণ করায় যে, আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় মনিব মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর গ্রন্থে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।

বাহন হিসেবে উট পরিত্যক্ত হবার ভবিষ্যদ্বাণী এবং রেলগাড়ী আবিস্কারের ভবিষ্যদ্বাণীটি যে যুগেই পূর্ণ হতো না কেন, তা একান্ত ঈমান উদ্দীপক হতো। ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্বটি আরো বেড়ে যায় যখন আমরা দেখি যে, তা পূর্ণ হবার নির্ধারিত সময়ও পূর্বেই বলে দেয়া হয়েছিল, অর্থাৎ কখন এই বিপ্লব সাধিত হবে। একথা বলা হয়েছিল যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে হবে আর এটি তাঁর সত্যতার একটি অন্যতম নিদর্শন হবে। অতএব দেখুন! যে শতাব্দীতে সর্বপ্রথম রেলগাড়ী আবিস্কৃত হয়েছে ঠিক সেই শতাব্দীতেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী - মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি ১৮৩৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন আর ১৮৯১ সনে আল্লাহ্ তা’লার কাছ থেকে ইলহাম পেয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হবার দাবী করেন। রেলগাড়ী যুক্তরাজ্যে আবিস্কৃত হয়। ১৮২৫ সনে প্রথম জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য রেলগাড়ী চালু হয় এবং যুক্তরাজ্যের ডারলিংটন হতে স্টকটন যায়। রেলগাড়ী আবিস্কার করেন জর্জ স্টিফেনসন। ১৮৩৬ সনে লন্ডনে রেলগাড়ী চলাচল আরম্ভ করে। ভারতে সর্বপ্রথম ১৮৫৩ সনে বোম্বে থেকে থানে পর্যন্ত রেলগাড়ী চলাচল করে এবং ৩৪ কি:মি: দূরত্ব সোয়া এক ঘন্টায় অতিক্রম করে। এরপর এতটাই উন্নতি করে যে, ১৯১০ সন নাগাদ ভারতে ৩২ হাজার মাইল পর্যন্ত লাইন বসানো হয়ে যায়।

মহানবী (সা.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দী পার হয়েছে কিন্তু ঠিক সেই শতাব্দীতে রেলগাড়ী আবিস্কৃত হয়েছে, যে শতাব্দীতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। এক শতাব্দী আগে বা পরে নয়। নাউযুবিল্লাহ্, যদি কোন খোদা না থেকে থাকেন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, মহানবী (সা.) কীভাবে জানলেন যে, রেলগাড়ী এবং মসীহ্ মওউদ

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

(আ.) একই যুগে আসবেন? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদীন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

নবীর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে অদৃশ্য জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া। মোটকথা এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হয়। এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতাও প্রতিপন্ন হয়। কেননা উনবিংশ শতাব্দীতে অন্য কেউ মসীহ্ মওউদ হবার দাবী করেন নি আর অন্য কেউই উষ্ট্র পরিত্যক্ত হবার এবং রেলগাড়ী আবিস্কার হওয়াকে নিজের সত্যতার স্বপক্ষে নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেন নি।

পবিত্র কুরআনের সূরা আত্ তাকভীরে ১২বার 'ইযা' বাক্য দ্বারা ১২টি মহান ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করা হয়েছে। যা বর্তমান যুগে পূর্ণ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করছে। এরমধ্য হতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে:

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۖ

এবং যখন বিভিন্ন জাতির লোকদেরকে একত্রিত করা হবে।

(সূরা আত্ তাকভীর: ৮)

আমাদের MTA (মুসলিম টেলিভিশন আহ্মদীয়া ইন্টারন্যাশনাল) অনবরত এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা স্মরণ করায়। আমাদের প্রতি এটি আল্লাহ্ তা'লার কত বড় অনুগ্রহ, আমাদের প্রিয় ইমাম যে স্থানেই বক্তব্য প্রদান করুন না কেন গোটা বিশ্বের আহমদীরা তাঁর বক্তব্য হতে কল্যাণমন্ডিত হতে পারে, আলহামদুলিল্লাহ্। এছাড়া এমটিএ ইসলাম প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমও বটে। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ইলহামের পূর্ণতা স্মরণ করায় যে,

'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো'।

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۖ এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার আরেকটি দিক হচ্ছে, এ যুগে জ্ঞানের সকল শাখার সাথে সম্পর্কিত সমাজ গঠণ করা হয়েছে, বিভিন্ন দেশে সম্মেলন ইত্যাদি হয়ে থাকে এবং দূরদূরান্তের মানুষ একস্থানে সমবেত হয়ে ভাবের আদান-প্রদান করে। ব্যাপক হারে টেলিফোন ব্যবহৃত হয়, এর মাধ্যমে আমরা দূরদূরান্তের দেশে বসবাসকারী মানুষের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলি। ফ্যাক্স এবং ই-মেইলের মাধ্যমে আমাদের চিঠিপত্র উড়োজাহাজের চেয়েও দ্রুতগতিতে গন্তব্যে পৌছে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে চিঠিপত্র প্রেরণের জন্য রেলগাড়ীও ছিল না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদীন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অধম এখন কুরআনের আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপন করছি যা বর্তমান যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত আর তাও অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে পূর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআন তা এভাবে বর্ণনা করেছে: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۖ *(সূরা আত্ তাকভীর: ১২)* অর্থাৎ একটি যুগ আসবে যখন আকাশের আবরণ তুলে ফেলা হবে অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা যথেষ্ট উন্নতি করবে।

সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মওউদ (রা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তফসীরে কবীরে বলেন,

> 'আকাশের আবরণ তুলে ফেলা হবে অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা বিস্ময়কর উন্নতি করবে। আমাদের ভাষায়ও বলা হয় যে, তোমরা তো চুলচেরা বিশ্লেষণ করো। যার অর্থ হচ্ছে, তোমরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় উদঘাটন করো। মোটকথা এ যুগে জ্যোতির্বিদ্যা কল্পনাতীত উন্নতি করেছে এবং নভোমন্ডলে যাতায়াত, বিশ্বের বিস্তৃতি, সৃষ্টি জগত এবং গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা গত সহস্র সহস্র বছরেও হয়নি।'

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

গ্যালিলিও ১৬০৯ সনে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিস্কার করেছিলেন। আর তিনি তারকারাজির আধিক্য দেখে ‘থ’ মেরে গিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার চার’শ বছর অতিবাহিত হবার পর এ বছর জাতিসংঘের আহবানে গোটা বিশ্ব International Year of Astronomy উদ্যাপন করছে। বর্তমান অবস্থায় কেবল যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানেই দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত রয়েছে তা নয় বরং পৃথিবীর চতুর্পার্শ্বেও দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঘূর্ণায়মান রয়েছে।

দু’শ বছর পূর্বে একটি তারকার দূরত্ব সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল না। ১৮৩৮ সনে প্রথম একটি তারার দূরত্ব জানা গিয়েছিল আর তা ছিল দশ আলোকবর্ষ। অর্থাৎ সেখান হতে আমাদের কাছে আলো পৌঁছতে সময় লাগে দশ বছর - যদিও আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কি:মি:। সূর্য পনের কোটি কি:মি: দূরত্বে অবস্থান করছে সেখান হতে আলো আসতে সময় লাগে মাত্র আট মিনিট। যদিও এসব তারকা সূর্য হতে প্রায় দশ লক্ষ গুণ দূরত্বে রয়েছে, এই তারকা Sygni-61 (সিগনি-৬১) নামে পরিচিত আর এই দূরত্বের জ্ঞান অর্জনকারী বিজ্ঞানির নাম হচ্ছে, F.W Bessel । যদিও সূর্যও একটি নক্ষত্র কিন্তু নিকটে অবস্থানের কারণে এত বড় এবং উজ্জ্বল বলে প্রতিভাত হয়। বর্তমান অবস্থা এমন যে, আমরা দূর-দূরান্তের নক্ষত্ররাজি এবং ছায়াপথসমূহের দূরত্বও জানতে পারি, যেখান হতে আলো আমাদের কাছে পৌঁছতে কোটি-কোটি বছর সময় লাগে, মোটকথা কোটি-কোটি বছর পূর্বে যে বিশ্ব ছিল আমরা তা আজ দেখছি। আজ যদি আমরা সংবাদ পাই যে, আরো অন্যান্য গ্যালাক্সি অর্থাৎ ছায়াপথ আবিস্কৃত হয়েছে আর সেখান হতে আলো আসতে দশ কোটি বছর সময় লাগবে তাহলে আমরা বিস্মিত হই না কেননা এমন কথা শুনতে আজ আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, যদিও দশ কোটি আলোকবর্ষ অনেক দীর্ঘ দূরত্ব।

মোটকথা পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ এত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদিন ওয়া আলে মুহাম্মদ।

এবার আমি রসূলে করীম (সা.)-এর আর একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করতে চাচ্ছি, যার সম্পর্ক রয়েছে সূর্যের সাথে। হাদীস শরীফে এসেছে:

> ‘লা ইয়াখরুজুল মাহদী হাত্তা তাতলুআশ্ শামসু আয়াতান’
>
> অর্থাৎ, হযরত ইমাম মাহদী তখন আবির্ভূত হবেন যখন সূর্যের মাধ্যমে একটি নিদর্শন প্রকাশ পাবে।

(বেহারুল আনোয়ার)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ার পঞ্চম খন্ডের ১৮১ পৃষ্ঠায় এই ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করে বলেন:

> ‘এবং লেখা আছে যে, তখন সূর্যের মাধ্যমে একটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে সুতরাং এটি এখন জানা কথা এবং দূরবীক্ষণের মাধ্যমে দেখাও সম্ভব।’

নি:সন্দেহে নভোমন্ডলে সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু হচ্ছে সূর্য। অতীতকাল থেকে মানুষ সূর্য দেখে আসছে আর বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞজনরাও প্রত্যক্ষ করেছেন। এতদসত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে আমরা এটি জানতাম না যে, সূর্য কোন কোন উপাদানে গঠিত আর এর তাপমাত্রা কত। ১৮১৪ সনে একজন বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী যার নাম ছিল ফ্রাউনহফার, তিনি সূর্যের আলো বিশ্লেষণ করে দেখতে পান যে, সূর্যের আলোতে বিভিন্ন রঙ ছাড়াও কতক কৃষ্ণরেখা রয়েছে। এটি বিজ্ঞানের অনেক বড় এক গবেষণা। আর সূর্যের এই Spectrum অর্থাৎ বর্ণালীকে Fraunhofer Spectrum বলা হয়। অধমের দৃষ্টিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সূর্যের ভেতর একটি নিদর্শনের যে উল্লেখ করেছেন তা এই Fraunhofer Spectrum -ই, যা দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং স্পেকটোসকোপ অর্থাৎ বর্নালীবিক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে। Fraunhofer এটি বুঝতে পারেনি যে, সূর্যের আলোতে কৃষ্ণরেখা কেন রয়েছে? দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর ১৮৫৯ সনে অন্য আরেকজন জার্মান বিজ্ঞানী কার্শফ এই রহস্য উদঘাটন

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

করেছেন। রহস্যটি হচ্ছে, সূর্যের চতু:পার্শ্বে একটি আবহমন্ডল আছে যেখানে সূর্যের চেয়ে তাপমাত্রা কম আর তা সেই আলো হতে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে আকর্ষণ করে আর এর ফলে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের স্থলে কৃষ্ণরেখা দৃশ্যমান হয়।

পরবর্তীতে সূর্যের এই আবহমন্ডলের নাম দেয়া হয়েছে Chromosphere (ক্রোমোসফেয়ার) । সূর্যের যে উপরিভাগ আমরা দেখতে পাই তাকে Photosphere (ফটোসফেয়ার) বলা হয়। আদি যুগ থেকে মানুষ সূর্যের একটি আবহমন্ডল সম্পর্কে অবহিত ছিল যাকে Corona (করোনা) বলা হয় আর তা ছিল সাদা রঙের এবং পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময় যা সূর্যের চতু:পার্শ্বে দেখা যায়। তিন হাজার বছরের অধিক কাল থেকে আমরা Corona (করোনা)-র সাথে পরিচিত।

সূর্যের Photosphere (ফটোসফেয়ার) এবং Corona (করোনা)-র মধ্যস্থলে যে Chromosphere (ক্রোমোসফেয়ার) রয়েছে তা উনবিংশ শতাব্দীর গবেষণার আবিস্কার। মোটকথা Fraunhofer Spectrum - উনবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর মৌলিক আবিস্কার যদ্বারা সূর্যের আবহমন্ডল সম্পর্কে জ্ঞান লাভে অসাধারণ সহায়তা পাওয়া যায়। সূর্যের Spectrum বা বর্ণালী সম্পর্কে গবেষণার ফলে এটি জানা যায় যে, সূর্য কোন কোন উপাদানে গঠিত। এখানে চিত্তাকর্ষক বিষয় হচ্ছে, হিলিয়াম (এক প্রকার গ্যাস) পৃথিবীতে নয় বরং সূর্যে প্রথম আবিস্কৃত হয়েছে এর বর্ণালীর মাধ্যমে। গ্রীক ভাষায় সূর্যকে হিলিওস বলা হয় তাই এর নাম হিলিয়াম রাখা হয়েছে।

১৮৬৮ সনে সূর্যের বর্ণালী নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে হিলিয়াম আবিস্কার করা হয়েছে আর এর অনেক বছর পর ১৮৯৫ সনে তা পৃথিবীতে আবিস্কৃত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। বর্তমানে সূর্য নিয়ে বড় বড় গবেষণা হচ্ছে, কিন্তু Solar Physics বা 'সৌর পদার্থবিদ্যা' বিষয়ের সূচনা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে হয়েছে আর এক্ষেত্রে Fraunhofer Spectrum-এর মৌলিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদিন ওয়া আলে মুহাম্মদ।

পবিত্র কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞানের সত্যায়ন

এখন এই অধম পবিত্র কুরআনের এমন একটি মহান সত্যতা সম্পর্কে উল্লেখ করতে চায় যা উনবিংশ শতাব্দীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বড় গবেষণাগুলোর অন্যতম একটি গবেষণা। অধম উল্লেখ করেছিলাম যে, নক্ষত্ররাজির দূরত্ব জানার সূচনা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। এরপর দ্রুততার সাথে উন্নতি ঘটেছে বিংশ শতাব্দীতে, আমরা এটিও জানতে সক্ষম হয়েছি যে, নক্ষত্ররাজি যা আকাশে বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করতে দেখা যায় তা এক বিশাল ব্যবস্থাপনার অংশ যাকে গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ বলা হয়। আমাদের ছায়াপথে কমবেশি দশ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে। এরমধ্যে একটি হচ্ছে আমাদের সূর্য। সূর্য ছায়াপথের কেন্দ্র হতে দশ হাজার আলোকবর্ষ দূরত্বে রয়েছে। আর ছায়াপথের কেন্দ্রবিন্দুর চতু:পার্শ্বে এক পাক খেতে সূর্যের সময় লাগে বিশ কোটি বছর, যদিও সূর্যের গতি প্রতি সেকেন্ডে ২০০ কিলো মিটারের অধিক। এই ছায়াপথ এতটাই বড় যে, এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আলো পৌঁছতে এক লক্ষ বছর সময় লাগে। ১৯২০ সনের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল সমস্যা ছিল, এই মহাবিশ্বে আমাদের ছায়াপথই কি একমাত্র ছায়াপথ না-কি আরো কোন ছায়াপথ আছে। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বলেন, আরো অনেক ছায়াপথ আছে। এছাড়া মহাবিশ্বে সাধারণত গ্যালাক্সিগুচ্ছ অর্থাৎ Cluster of Galaxies দেখতে পাওয়া যায়। ১৯২৯ সনটি ঐতিহাসিক বছর যখন হাবল এর মাধ্যমে এই অপূর্ব আবিস্কার হয়েছে যে, এই গ্যালাক্সীসমূহের বিপুল সমাগম একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর আমাদের থেকে যে গ্যালাক্সীর দূরত্ব বেশি তার দুরে সরার গতিও ততটাই বেশি। এই আবিস্কারকে হাবলের সূত্র বলা হয়। বর্তমান যুগে মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন করে যেসব তথ্য জানা গেছে তার মধ্যে এটি মৌলিক গুরুত্ব রাখে। এথেকে জানা গেছে যে, আমাদের মহাবিশ্ব স্থির নয় বরং প্রসারিত হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

وَالسَّمَآءَ بَنَيۡنٰهَا بِاَيۡىدٍ وَّاِنَّا لَمُوۡسِعُوۡنَ

অর্থাৎ, এবং আমরা আকাশকে একটি বিশেষ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছি আর নিশ্চয়ই আমরা সম্প্রসারণকারী।

(সূরা আয যারিয়াত: ৪৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর গ্রন্থে বলেন,

> ‘স্মরণ রাখা আবশ্যক এমন মহাবিশ্বের ধারণা যা প্রতিনিয়ত বিস্তৃত হচ্ছে তা কেবল পবিত্র কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে অন্য আর কোন ঐশী গ্রন্থে এর প্রতি দূরতম ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। মহাবিশ্ব ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করছে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এই আবিস্কার অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে কেননা, এর ফলে বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য বুঝা তাদের জন্য সহায়ক হচ্ছে। আবিস্কারের দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্ব সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপসমূহ এমনভাবে সুস্পষ্ট করে যা বিগ ব্যাং (Big Bang) এর দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পুরো সামঞ্জস্য রাখে।’

(Revelation, Rationality, Knowledge and Truth - p.261)

নাউযুবিল্লাহ্, পবিত্র কুরআন যদি খোদার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত না হতো তাহলে প্রশ্ন উঠতো যে, মহানবী (সা.) কি করে জানলেন যে, আমাদের বিশ্ব সংবদ্ধ এবং কোন স্থির বস্তু নয় বরং প্রসারিত হচ্ছে, আর এটি বিংশ শতাব্দীর গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত। আর শক্তিশালী দূরবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এবং ছায়াপথের আলো বিশ্লেষণ করে তার Spectrum অর্থাৎ বর্ণালী সম্পর্কে গভীর গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।

আলবার্ট আইনস্টাইনকে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী বলে গণ্য করা হয়। তার Relativity Theory বা আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে তিনি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছিলেন যে, বর্তমান বিশ্ব বিস্তৃত হচ্ছে কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন যে এমনটি হতে পারে না তাই তিনি স্বীয় সূত্রে পরিবর্তন এনে তাতে Cosmological Constant নামক একটি ধ্রুবক যুক্ত করেছেন যাতে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত না হয়। হাবল যখন এটি প্রমাণ করেন, সত্যিই বিশ্ব বিস্তৃত হচ্ছে। তখন তিনি এই কর্মকে “The biggest blunder of my life” বলেছেন, অর্থাৎ এটি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। এবার দেখুন! পবিত্র কুরআনে এত বেশি বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যা মূলত: বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতেও ইতোপূর্বে ছিল বিস্ময়কর। এটি কি প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ্ আছেন? আর তিনি তাঁর পবিত্র রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছেন?

গ্যালাক্সী সমূহের পরস্পর হতে দূরে সরে যাবার ঘটনা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, অনেক কাল পূর্বে সকল গ্যালাক্সী পরস্পরের খুবই নিকটে ছিল। বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বর্তমানে যে দৃষ্টিভঙ্গী স্বীকৃত তা হচ্ছে সূচনালগ্নে বিশ্বের সকল উপকরণ ক্ষুদ্র একটি স্থানে সংবদ্ধ ছিল আর তা প্রচন্ড গরম এবং এর ঘনত্ব ছিল খুব বেশি। এরপর একটি বিগব্যাং অর্থাৎ মহা বিস্ফোরণ ঘটে ফলে সেসব উপকরণ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারপর সেসব অংশ ধীরে ধীরে পরস্পর হতে দূরে সরে যেতে থাকে। এর মধ্য হতে বিভিন্ন সৌর জগত এবং নক্ষত্ররাজি জন্ম নিয়েছে। ১৯৬৫ সনে Radio Astronomy’র (বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান) মাধ্যমে একটি বিশ্ব ৩ ডিগ্রি কেলভিন এর তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে মানুষ জানতে পেরেছে, যদ্বারা এই দৃষ্টিভঙ্গী স্বীকৃতি পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর এই মহান গবেষণা সম্পর্কেও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র কুরআন বলে:

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ

অর্থ: যারা অস্বীকার করেছে তারা কি এটি দেখে নাই যে, আকাশসমূহ্ এবং পৃথিবী উভয়ই সংবদ্ধ (পিন্ডাকারে) ছিল। অত:পর আমরা উভয়কে ছিড়ে-ফেড়ে পৃথক করে দিলাম এবং পানি হতে আমরা প্রত্যেক জীবিত বস্তুর উদ্ভব করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

(সূরা আল্ আম্বিয়া: ৩১)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর অনুদিত কুরআন মজীদের উর্দূ অনুবাদে এই আয়াত সম্পর্কে নোট দিয়েছেন:

‘এটি এমন আয়াত যা বিশ্বের রহস্যকে এমনভাবে উম্মোচন করে যা সে যুগের মানুষের দৃষ্টিতে ছিল কল্পনাতীত।’ তিনি বলেন, ‘গোটা বিশ্ব দৃঢ়সংবদ্ধ এমন বলের মত ছিল যা থেকে কোন বস্তু বাইরে বেরোতে পারতো না তারপর আমরা একে বিস্ফোরণ ঘটাই ফলে নিমেষে পুরো বিশ্বের এখেকে উদ্ভব ঘটে, তারপর পানির মাধ্যমে প্রত্যের জীবিত বস্তু সৃষ্টি করে।’

বর্তমান বিজ্ঞানের সূত্র মতে চৌদ্দশ কোটি বর্ষ পূর্বে বিগ ব্যাং এর ঘটনা ঘটেছিল। ১৪০০ বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনের এটি বর্ণনা করা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। পবিত্র কুরআন বলে, তবুও কি মানুষ ঈমান আনবে না? আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী মি: হ্যারি এল শিপম্যান তার গ্রন্থ Black Holes, Quasars and the Universe এর শেষদিকে লিখেন:

‘বিগ ব্যাং (**Big Bang**) এর দৃষ্টিভঙ্গী একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ। কে এই উপকরণ সৃষ্টি করেছিলেন যা প্রচন্ডরূপে বিস্ফারিত হয়েছে। জ্যোতির্বিদদের কাছে এর কোন উত্তর নেই। আমাদের দৃষ্টি সে পর্যন্ত পৌঁছে যায় যখন বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে কয়েক সেকেন্ড পূর্বে মাত্র কিন্তু সেখানে গিয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তি থেমে যায়। এই সৃষ্টি সমস্যাকে দার্শনিক এবং ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানীদের কাঁধে তুলে দিয়ে এই পুস্তক এখানেই শেষ হচ্ছে।’

(Haughton Moffin Company, Boston University-USA, 1976 P-288)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ ইসলামী নীতি দর্শনে এই প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়েছেন, তিনি বলেন:

‘দ্বিতীয় প্রমাণ, খোদা তা’লার অস্তিত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআন খোদা তা’লাকে সব কারণের আদি কারণ নির্দিষ্ট করেছে। যেমন খোদা বলেন, وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ***(সূরা আন্ নাজম: ৪৩)*** অর্থাৎ: কার্য ও কারণের সকল শৃঙ্খল তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নিকট গিয়ে শেষ হয়। এই যুক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা জানতে হলে গভীর চিন্তার প্রয়োজন। যত কিছু আছে সবই কার্য ও কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই জন্য পৃথিবীতে নানারূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। কেননা সৃষ্টির কোন অংশই এই শৃঙ্খল বহির্ভূত নয়। কোনটি অন্য কোনটির জন্য সূত্র আবার কোনটি শাখা বা প্রশাখা। এটি সুস্পষ্ট যে, কোন একটি কারণ হয় স্বীয় সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত নয়তো তার অস্তিত্ব অন্য কোন কারণ হতে উদ্ভূত হবে। তারপর দ্বিতীয় কারণ অন্য কারণের উপর নির্ভরশীল এবং এই প্রকারেই সমগ্র শৃঙ্খল নির্মিত। এটি হতে পারে না যে, এই সসীম জগতে কার্য ও কারণের শৃঙ্খল কোথাও গিয়ে শেষ হবে না। আর অসীম হলেও প্রয়োজনের খাতিরে মানতে হয় যে, এই শৃঙ্খল নিশ্চয় কোন না কোন কারণে পৌঁছে শেষ হয়েছে। অতএব এই সব শৃঙ্খল যাঁর কাছে গিয়ে

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

শেষ হয়েছে তিনিই খোদা। চক্ষু মেলে দেখ! وَاَنَّ اِلٰی رَبِّکَ الۡمُنۡتَہٰی এই আয়াত সংক্ষিপ্ত কথায় কি সুন্দরভাবে উপরোল্লিখিত যুক্তি প্রদান করছে। এর অর্থ হচ্ছে, সব শৃঙ্খল তোমার স্রষ্টা পালনকর্তায় পৌঁছে শেষ হয়েছে'।

(ইসলামী নীতি দর্শন, পৃ: ৬৪)

পবিত্র কুরআনে এই সত্য বিবরণও বর্ণিত হয়েছে যে, সবকিছুই নশ্বর। সূরা আর্ রাহমানে বলা হয়েছে:

كُلُّ مَنۡ عَلَیۡہَا فَانٍ وَّ یَبۡقٰی وَجۡہُ رَبِّکَ ذُو الۡجَلٰلِ وَ الۡاِکۡرَامِ

অর্থাৎ: ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, এবং অবিনশ্বর হয়ে থাকবে কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি প্রতাপ এবং সম্মানের অধিপতি।

(সূরা আর্ রাহমান: ২৭-২৮)

এরপর সূরা আর্ রা'দে বলেন: كُلٌّ یَّجۡرِیۡ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ***(সূরা আর্ রা'দ: ৩)*** অর্থাৎ: ঘুর্ণায়মান গ্রহ-নক্ষত্র সবই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গতিশীল থাকবে। এগুলো সর্বদা চলমান থাকবে না। বর্তমান যুগের বিজ্ঞান পবিত্র কুরআনের এই সত্যকেও সত্যায়ন করেছে। আমরা যুগ যুগ ধরে এটি দেখে আসছি যে, মানুষ জন্ম নেয়, বড় হয় তারপর একসময় আবার দুর্বলতার যুগ আসে পরিশেষে সে মারা যায়, অনুরূপভাবে জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের উপর মৃত্যু নেমে আসে কিন্তু পৃথিবী এবং নভোমন্ডলেরও যে ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসবে, এটি বর্তমান যুগের গবেষণা থেকে প্রমাণিত। মরুভূমির বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর বয়স নিরূপন করা যেতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীর বয়স সাড়ে চার'শ কোটি বছর বলে ধারণা করা হয়। সূর্য এবং সৌরজগতের বয়স পাঁচ'শ কোটি বছর বলে অনুমান করা হয়। এবং ধারণা করা হচ্ছে যে, সূর্যের ভেতর যে হাইড্রোজেন জ্বলছে এবং নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে হিলিয়ামে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা আগামী প্রায় পাঁচ'শ কোটি বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এরপর সূর্যের আকৃতি অনেক বড় হয়ে যাবে। বুধ গ্রহ পর্যন্ত সূর্য বিস্তৃত হয়ে পড়বে। প্রচন্ড গরমে সে সময় আমাদের পৃথিবীর সমুদ্রের পানি বাষ্পিভূত হয়ে উড়ে যাবে এবং এ ধরা পৃষ্ঠ হতে প্রাণের অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে। এরপর সূর্যের আরেক পর্যায় আসবে যখন তা সংকুচিত হতে থাকবে, এমনকি এর আকৃতি একটি গ্রহের সমান হয়ে যাবে। তখন সূর্যের আলো হ্রাস পাবে। এধরনের নক্ষত্রকে White Dwarf বলা হয়। এই যুগ যেন সূর্যের বার্ধক্যের যুগ হবে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: **Exploration of the Universe by Abell**)

সূর্য হলুদাভ দেখা যায়। তারকারাজির বিভিন্ন রঙ হয়ে থাকে আর বয়সও ভিন্ন ভিন্ন। মোটকথা অগণিত তারকারাজি যা এখন ঘুর্ণায়মান তাদের সবার বয়সই সীমিত। যেভাবে পবিত্র কুরআন বলেছে. كُلٌّ یَّجۡرِیۡ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ***(সূরা আর্ রা'দ: ৩)*** অর্থাৎ: সবই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গতিশীল থাকবে। বর্তমান বিজ্ঞানও একে সমর্থন করে।

'অধুনা গবেষণা এ ব্যাপারে একমত যে, Proton (পরমাণু কেন্দ্রের অঙ্গীভূত ধণাত্মক আধানযুক্ত কণিকা-অনুবাদক)-এর একটি নির্ধারিত বয়স আছে, যা অতিক্রম করার ক্ষমতা তার নেই; যদিও পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষকগণ ইতোপূর্বে Proton এর আয়ুষ্কাল অসীম বলে মনে করতো'।

(Revelation, Rationality, Knowledge and Truth - p.273)

পদার্থ বিজ্ঞানের একটি স্বীকৃত সূত্র হচ্ছে এন্ট্রপি (Entropy) সর্বদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ, মহাবিশ্বে (Disorder) বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলাফল হচ্ছে, 'মহাবিশ্বে যেসব উপাদান আছে তার খুব সামান্য অংশ শক্তির আকারে নষ্ট হতে থাকে এবং একে কখনই পুনরায় কোনভাবে অর্জন করা যায় না।'

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

এছাড়া হুযূর আকদাস (রাহে.) তাঁর গ্রন্থে লিখেন:

> ‘ক্ষয়ীষ্ণু এবং অনাদি-অনন্ত একসাথে চলতে পারে না। বস্তু অনবরত ক্ষয় হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট থাকবে তা অসম্ভব। প্রত্যেক ক্ষয়শীল বস্তু অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে।’

মোটকথা যেভাবে বিশ্বের সূচনা খোদা তা’লার প্রতি ইঙ্গিত করে অনুরূপভাবে বিশ্বের ধ্বংসও খোদা তা’লার প্রতি ইঙ্গিত করছে। সৈয়দনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর একটি দূর দৃষ্টিসম্পন্ন উদ্ধৃতি পাঠ করে বক্তৃতা শেষ করছি। তিনি স্বীয় গ্রন্থ ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তকে বলেন:

> ‘অত:পর তিনি তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়েছেন আর তা হলো: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ *(সূরা আর্ রাহমান: ২৭-২৮)* অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষ লয়শীল এবং যিনি অবিনশ্বর, তিনি হলেন খোদা! মহাপ্রতাপান্বিত ও মহামর্যাদাবান। এখন দেখ, যদি আমরা ধরে নেই যে, পৃথিবী রেণু রেণু হয়ে যাবে এবং নক্ষত্রনিচয় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং তার লয়ের নিমিত্ত এমন এক বায়ুর প্রবাহ সৃষ্টি হবে যে, এসব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তবু বুদ্ধি ও যুক্তি একথা মানবে ও স্বীকার করবে, বরং সুস্থ বিবেক এটিই আবশ্যক জ্ঞান করবে যে, এই সম্যক লয়ের পরেও একটা কিছু অবশিষ্ঠ থাকবে, যা লয় হবে না। এবং পরিবর্তন স্বীকার করবে না বরং স্বীয় প্রথম অবস্থায় অনড় থাকবে। অতএব তিনিই সেই খোদা, যিনি সকল লয়শীল অস্তিত্ব প্রকাশ করেছেন এবং স্বয়ং লয়ের হস্ত হতে নিরাপদ রয়েছেন।’

(ইসলামী নীতি দর্শন, পৃ: ৬৬)

আল্লাহ্ তা’লা সবাইকে স্বীয় তত্ত্বজ্ঞান লাভের তৌফিক দিন, আমীন।

ওয়া আখিরুদ্ দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

(অনুবাদ: আহমদ তারেক মুবাশ্বের)

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.